শিক্ষাবান্ধব ছাত্ররাজনীতি দরকার

১২ নভেম্বর ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ১২ নভেম্বর ২০১৯ ০১:১২

অনেকেই প্রশ্ন করেন, পৃথিবীর কোথাও ছাত্ররাজনীতি না থাকলে বাংলাদেশে থাকবে কেন? ছাত্ররাজনীতি আমাদের জন্য অভিশাপ নাকি আশীর্বাদ, কোনটি? প্রশ্নগুলো খুব জটিল কিন্তু বিশ্লেষণযোগ্য। আমরা যে ভূখ- বাস করছি, তার ইতিহাস ও সংস্কৃতি অন্য দেশগুলো থেকে অনেকটাই ভিন্ন। এই ভূখ-র মানুষদের দীর্ঘদিন বিদেশি শক্তির হাতে পরাধীন থাকতে হয়েছে। মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তা বারবার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। কখনো মানুষ নিগৃহীত হয়েছে, কখনো হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে, কিন্তু কখনো স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে নিজেদের বিচ্যুত করেনি। একসময় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় সে আন্দোলন মানুষ দুভাবে করেছে। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন, গান্ধীজির অহিংসার নীতি ভারতের স্বাধীনতা আনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। সে কারণে তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের পক্ষপাতী ছিলেন। মত ও পথ ভিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই স্বাধীনতা আন্দোলনে কার ভূমিকা বেশি ছিল, এটি নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু মহতী মানুষের বহুমাত্রিক ভাবনা বা দর্শনের যে কোনো পরিমাণগত তুলনা করা যায় না, সেটি মানুষ বুঝতে চায় না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই ভিন্নমুখী দর্শন মানুষকে রাজনৈতিক সচেতন করেছে। এই ভূখ-র মানুষ অন্য যে কোনো ভূখ-র মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি রাজনৈতিক সচেতন। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলেও বাঙালিদের পরাধীনতা ঘোচেনি। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান একীভূতকরণের ক্ষেত্রে দ্বিজাতি তত্ত্ব যে ভুল ছিল, তা প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তান মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার হরণ করে আগ্রাসী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এ আগ্রাসন কেবল এই ভূখ-র মানুষের ব্যক্তিসত্তার ওপর ঘটেনি, বরং বাঙালির সর্বজনীন সত্তার ওপর ঘটেছিল। বিষয়টি বঙ্গবন্ধু তার সর্বজনীন চিন্তাশক্তির ইতিবাচক দর্শনের মাধ্যমে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একটি জাতির মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সন্নিবেশ থাকবে। ধর্মের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও সব ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ। মানুষ তার নিজ নিজ জায়গা থেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। সবার ধর্মীয় অধিকার সমভাবে সংরক্ষিত হবে। সেটি সংখ্যাতাত্ত্বিক ধারণার ভিত্তিতে নিশ্চিত হবে না বরং জাতিসত্তার সম্প্রীতি, পরিচয়, ইতিহাস, সংস্কৃতির ভিত্তিতে নিশ্চিত হতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটেছে। এই বাঙালি জাতিসত্তার সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এভাবে ক্রমান্বয়ে আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সম্প্রসারিত হয়েছে। এই রাজনৈতিক চেতনা সব বয়সের মানুষকে কমবেশি প্রভাবিত করেছে। ছাত্ররাও এই প্রভাবের বাইরে থাকেনি। তবে সব সময় ইতিবাচক রাজনীতির অন্তরালে নেতিবাচক রাজনীতির কাজ করে গেছে। এখনো রাজনীতিতে তাদের কৌশল ও সক্রিয়তা দৃশ্যমান। আমাদের সামগ্রিক রাজনীতিকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। এগুলো হলো ব্রিটিশপূর্ব রাজনীতি, বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব রাজনীতি, পঁচাত্তরপূর্ব রাজনীতি ও পঁচাত্তরপরবর্তী রাজনীতি। স্বাধীনতাপূর্ব রাজনীতির যে ধারা বিদ্যমান ছিল, সেখানে ছাত্রদের মধ্যে নিজের ভূখ-র প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের প্রকাশ ঘটেছিল। ছাত্ররা মানুষের অধিকার ও কল্যাণে রাজনীতিতে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, ছাত্ররা নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করে রাজনীতির মাধ্যমে মানুষকে অধিকারসচেতন করতে সক্ষম হয়েছে। এই রাজনীতিতে ভোগ ছিল না, ত্যাগ ছিল। নিজের স্বার্থ ছিল না, সর্বজনীন স্বার্থ ছিল। মেধাবী ছাত্ররা এ সময় ছাত্ররাজনীতি করাকে যৌক্তিক ও প্রয়োজন বলে মনে করত। বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির আবহমান সংস্কৃতি ও ইতিহাস রয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৬২-র কুখ্যাত হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, '৬৬-র ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ১১ দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন, '৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনসহ প্রতিটি ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণের প্রেক্ষাপট তৈরি ও আন্দোলনকে সফল করার মূলশক্তি হিসেবে তৎকালীন শিক্ষার্থীদের অবদান অনস্বীকার্য। পরবর্তী সময়ে '৯১-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও এ দেশের ছাত্ররাজনীতির ঐতিহাসিক প্রভাব রয়েছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলের বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্রদের কারাভোগ, অন্যায়-অত্যাচার থেকে শুরু করে মৃত্যুকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করতে হয়েছে। তার পরও অপশক্তির কাছে ছাত্ররা কখনো মাথা নত করেনি। ছাত্ররাজনীতি চলত আদর্শ ও দর্শনের ওপর ভিত্তি করে। একই ইতিবাচক ছাত্ররাজনীতির ধারা বিভিন্ন দেশে সংঘটিত হয়েছে। যার মূল ধারণা ছিল অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা। ১৯৪৮ সালে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল

advertisement

ছাত্ররা। শুভ চিন্তার বিশ্বাস ও স্বপ্ন নিয়ে ১৯৫৫ সালে আর্জেন্টিনায়, ১৯৫৮ সালে ভেনিজুয়েলায়, ১৯৬০ সালে কোরিয়ায় ছাত্রদের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে ওঠে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও বলিভিয়ায় ১৯৬৪ সালে জাতির দুঃসহ সংকটে ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। রাশিয়ায় 'জার' শাসনামলে ছাত্রদের মাধ্যমেই বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছাত্রদের রাজনীতি প্রচলিত আছে। ইংল্যান্ডে বিভিন্ন ধরনের ছাত্র সংগঠন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। তবে এই ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকে না। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলোÑ ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ডের মতো বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভোটের মাধ্যমে ছাত্রনেতা নির্বাচিত করা হয়। ইউরোপের ডেনমার্ক, জার্মানি, অস্ট্রিয়ায় ছাত্ররা রাজনীতিতে সম্পৃক্ত রয়েছে। ডেনমার্কের ছাত্ররা কনজারভেটিভ স্টুডেন্টস ও লিবারেল স্টুডেন্টস নামের দুটি রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকা- অংশগ্রহণ করে। এই দুটো সংগঠনই বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসরণ করে কাউন্সিলের মাধ্যমে তাদের নেতা নির্বাচন করে থাকে। জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অ্যাসোসিয়েশন অব ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস ও ফেডারেল অ্যাসোসিয়েশন অব লিবারেল স্টুডেন্টস বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে তাদের মতামত প্রদান করে। তবে এই ছাত্র সংগঠন দুটি পরিকল্পিত নীতি ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। অস্ট্রিয়ায় প্রধান ছাত্র সংগঠন হিসেবে কাজ করছে সোশ্যালিস্ট স্টুডেন্টস অব অস্ট্রিয়া। এ দেশটির সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ছাত্র সংগঠনটির শাখা রয়েছে। এরা দেশব্যাপী বিশ্বায়ন বিপক্ষে ও শান্তির পক্ষে প্রচারণা চালায়। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও ছাত্রদের যে সংগঠনগুলো রয়েছে তারা ছাত্রসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, রাষ্ট্রীয় ইস্যু, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিশ্ব শান্তির পক্ষে তাদের মতামত দিয়ে থাকে। এ ধরনের সংগঠনের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো প্রভাব থাকে না। সারা বিশ্বে যে ছাত্ররাজনীতি প্রচলিত আছে, তা আমাদের ছাত্ররাজনীতির ধারণা থেকে অনেকটাই ভিন্ন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাতবরণ করলে ছাত্ররাজনীতি তার স্বাভাবিক গতিপথ হারায়। আদর্শ ও দর্শনভিত্তিক রাজনীতির জায়গায় ছাত্ররাজনীতিতে ভোগবাদী ধ্যানধারণা তৈরি হয়। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এ সংগঠনগুলোকে বিভিন্ন নেতিবাচক কাজের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলে। ত্যাগের রাজনীতি ক্রমেই শক্তি হারিয়ে পেশিশক্তির ছাত্ররাজনীতিতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থ ও কল্যাণের বিষয়টি ছাত্ররাজনীতিতে গৌণ হয়ে ছাত্রনেতাদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থ প্রাধান্য পায়। কেন বঙ্গবন্ধুর দর্শনভিত্তিক চেতনা ও ধারণা থেকে সরে গিয়ে ছাত্ররাজনীতি অপরাজনীতিতে রূপান্তরিত হলো, সে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা দরকার। এর অন্যতম প্রধান একটি কারণ হলো বাংলাদেশে বারবার গণতন্ত্র নির্বাসিত হয়েছে। গণতন্ত্রের বদলে স্বৈরাচারী শক্তি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য জনকল্যাণ ও দর্শনভিত্তিক রাজনীতির পরিবর্তে রাজনীতিকে অর্থকেন্দ্রিক অনৈতিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এর ফলে অনেক রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে অনেক সাধারণ মানুষও দুর্নীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ফলে মানবিক সমাজব্যবস্থার বদলে ভারসাম্যহীন একটি সমাজ কাঠামো ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছাত্ররাজনীতির ওপর গিয়ে পড়ে। এর সঙ্গে ছাত্ররাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে অপশক্তির দ্বারা প্রভাবিত ছাত্রদের আরেকটি রাজনৈতিক ধারা কাজ করেছে। এরা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ট্রয়ের ঘোড়া হিসেবে আগেও কাজ করেছে, এখনো করছে। এ গোষ্ঠীটি বিভিন্নভাবে নানা কৌশল অবলম্বন করে ছাত্রদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এর সঙ্গে তারা বর্তমান সময়ে গুজব ছড়ানোর মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য ফেসবুকসহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছে। সেটা যা-ই হোক, শুভ চিন্তার ছাত্ররাজনীতি অশুভ চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় এবং অপশক্তির রাজনীতি সক্রিয় থাকায় সার্বিকভাবে সেটি ছাত্ররাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। এখন সময় এসেছে শুভ শক্তির দর্শনভিত্তিক স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী বিশুদ্ধ ছাত্ররাজনীতিকে নতুনভাবে সাজানোর। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। বরং ছাত্রদের আগামী দিনের নির্লোভ নেতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ছাত্ররাজনীতিকে ইতিবাচক ধারায় নিয়ে আসতে হবে। যেখানে পদ-পদবি মূল বিষয় হবে না। বরং শিক্ষা ও ছাত্রকল্যাণই হবে ছাত্ররাজনীতির মূল উদ্দেশ্য। ছাত্ররা রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থেকে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নীতকরণসহ নিজেদের গবেষণায় ও নতুন উদ্ভাবনে সম্পৃক্ত করে নিজেকে এগিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশকে এগিয়ে নেবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্ররাজনীতির গুণগত মান পরিবর্তন ও বিশুদ্ধিকরণে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছেন, সাধারণ মানুষ সেখান থেকে ইতিবাচক ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হবে এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী :

শিক্ষাবিদ, কলাম লেখক